শেখ হাসিনা-একজন নেতা, একজন যোদ্ধা

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ, উন্নয়ন ও মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উন্নয়নে তার কোনো বিকল্প নেই। শেখ হাসিনার সততা, নিষ্ঠা, যৌক্তিক মানসিকতা, দৃঢ় মনোবল, প্রজ্ঞা ও অসাধারণ নেতৃত্ব বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে এক ভিন্ন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তিনি এখন বিশ্বখ্যাত নেতা হিসেবে পরিচিত।

আওয়ামী লীগ সব ধরনের শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার, প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করেছে এবং অব্যাহত রেখেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এটি জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য কাজ করে আসছে। এই দল যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন মানুষের ভাগ্যের উন্নতি হয়। এই দলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৭৪ বছরের ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাহসী কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে এবং তিনি জনগণের কল্যাণে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার অদম্য শক্তি, সাহস, মনোবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্ব বিস্মিত। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২৯তম এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এদিকে বাংলাদেশকে ২০২৬ সাল থেকে ‘মধ্যম আয়ের দেশ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২০৪১ সালে ‘উন্নত দেশ’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তার বড় প্রমাণ হলো গত কয়েক বছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৬৫ জন। অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় দেশ।

শেখ হাসিনা ৪টি মাইলফলক দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ, যা ইতোমধ্যে একটা ধাপ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), তৃতীয়টি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং চতুর্থটি হচ্ছে ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন করা। গত ১৫ বছরে দেশ পেয়েছে পদ্মা সেতু ও রেল সেতু। ঢাকা

মেট্রোরেল, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আধুনিক তৃতীয় টার্মিনাল, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসের প্রতিশ্রুতি তিনি অসম্পূর্ণ রাখেননি।

এরমধ্যে রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি মন্থর হয়ে পড়লেও তিনি এর প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে দেননি। নতুন সেতু ও সড়কের মাধ্যমে অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোভিড-১৯ মহামারিতে দলের অগণিত নেতা-কর্মী সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। নৌকা দ্রুত গতিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অন্ধকার থেকে এখন আলোর পথে।

শেখ হাসিনা এমন একজন নেতা এবং বিশ্বের কাছে আলোর আলোকবর্তিকা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে শুধু একটি বিরল মাত্রাই দেননি, বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে জোরদার করেছেন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রায়ই তাকে শুধু জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত, যা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়, কিন্তু যথেষ্ট নয়। বৈশ্বিক নেতৃত্ব তার অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের মতোই অতুলনীয় এবং তার অতুলনীয় নেতৃত্বের সম্পূর্ণ বিস্তৃতি তার প্রশংসা ছাড়া বোঝা যায় না।

অনেকের হয়তো মনে নেই যে, ২০ সালে শেখ হাসিনাসহ ১৮৯ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান মিলেনিয়াম ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। তিনি কেবল সেই ঐতিহাসিক দলিলের স্বাক্ষরকারী হিসাবে ইতিহাসে নিজের জন্য একটি স্থান তৈরি করেননি; কিন্তু এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে একটি বৈশ্বিক অঙ্গীকারের অংশীদার করে তুলেছেন। সেই অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করে তিনি বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ৮টি সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অঙ্গীকার করেন। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের হার ১৯৯০ সালের ৫৮ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৫৮ বছর থেকে বেড়ে ৭৩ বছর হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ৩৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১০০ থেকে কমে প্রতি হাজারে ২১ হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৩৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি ৩৩০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে – ১৯৯০ সালে ৩০০ ডলার থেকে ২০১৯ সালে ২,৬৪০ ডলারে।

প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জন প্রতিবেশী দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে গড় আয়ু ৭৩ বছর, ভারতে ৬৯ বছর এবং পাকিস্তানে ৬৭ বছর। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩১ জন, ভারতে ৩৮ জন, পাকিস্তানে ৬৭ জন।

২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং এই লক্ষ্যগুলি তার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড এই লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, নারী অধিকার, শিশু সুরক্ষা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত ও অভিনন্দন। আমরা সবসময় তাকে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থে কথা বলতে দেখেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড এই লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, নারী অধিকার, শিশু সুরক্ষা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত ও অভিনন্দন। আমরা সবসময় তাকে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থে কথা বলতে দেখেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আজ আমরা ২০৪১ সালের দিকে তাকিয়ে আছি, যখন আমরা বিশ্ব দরবারে উন্নত বিশ্বের অংশ হতে চাই। ভবিষ্যতের দুনিয়া দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আজ আমরা যে বিশ্বে বাস করছি, সেখানে বৈষম্য, অস্থিতিশীলতা এবং অপর্যাপ্ততা বাড়ছে। সুযোগ যেমন আছে, তেমনি দুর্বলতাও তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের এমন একজন নেতা দরকার, যিনি শুধু তার দেশের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন একজন নেতা- বিশ্বের আলো।

শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দিচ্ছেন। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকভাবে চান শিক্ষার্থীরা শুধু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করুক, বাকিটা সরকারের দায়িত্ব। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সময় অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী চান বাংলাদেশের শিশুরা শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে তাল

মিলিয়ে চলতে সক্ষম হোক। উপযুক্ত শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি সবাইকে সত্যিকারের শিক্ষিত শিশু হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ করে দিচ্ছেন। শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র হলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তিনি সংখ্যালঘুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ভারতকে টপকে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা দেশবাসীর সেই স্বপ্ন সঠিক পথে বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আওয়ামী লীগের সরকার দৃঢ় করে দেশের মানুষ আজ সুখ-সমৃদ্ধির নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা ইত্যাদি চালু করা হয়েছে।

সবার কল্যাণই শেখ হাসিনা সরকারের ঘোষিত নীতি। ১৪ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে ৩০ ধরনের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কারণে স্বাস্থ্য অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত একটি রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ওই রেজুলেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মডেল প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য উদ্ভাবনী নেতৃত্ব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে বলে বাংলাদেশে জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন জানিয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল তৈরি করায় জাতিসংঘের স্বীকৃতির পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করেছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি।

শুধু স্বাস্থ্যখাত নয়, ভূমিহীনদেরও বিনামূল্যে ঘর দিচ্ছে সরকার। সরকার শুধু ঘর নির্মাণের মাধ্যমে তার দায়িত্ব পালন করছে না, সরকারি প্রকল্পগুলো তাদের জীবন ও জীবিকাও প্রদান করছে। এ পর্যন্ত ২১টি জেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি মুজিববর্ষে প্রথম ধাপে ৬৩ হাজার ৯টি, দ্বিতীয় ধাপে ২০ জুন ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং তৃতীয় ধাপে ২ দফায় মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি ঘর বিতরণ করা হয়। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে করোনাভাইরাস মহামারির সময়

বাংলাদেশের জনগণ বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দেশের মানুষের জন্য সঠিক সময়ে টিকা আনতে পারে। এই সাফল্যের মূল কারিগর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কোভিড-১৯ মোকাবেলার পাশাপাশি তিনি সে সময় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাফল্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছে বিশ্ব। সে সময় বেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশের প্রশংসা করেছিল। করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পর বিশ্বের অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। করোনার কারণে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করা সমালোচকদের মুখে বাংলাদেশের উন্নয়ন ছিল একটি থাপ্পড়।

শেখ হাসিনার হাত ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এখন লাল-সবুজের দেশটি স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যেখানে সকল নাগরিক সেবা হাতের নাগালে পাওয়া যাবে। এই ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশের কেউ ক্ষুধার্ত থাকতে পারবে না। আওয়ামী লীগ সরকার সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরের সাফল্যই নৌকার বিজয়ের আসল হাতিয়ার।

যখন বাংলাদেশের সংকট তীব্র হয়, সবকিছু যখন অনিশ্চয়তাকে ঘিরে ঘোরে, বাংলার আকাশে কালো মেঘ জমে থাকে, তখন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়ান। একজন মানুষ অদম্য সংকল্প ও নিষ্ঠার সাথে ভয়ের কালো মেঘ মুছে দেয় এবং দেশের মানুষ আশার আলো দেখতে পায়। যখনই মনে হয় যে সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটি খারাপ সময়ের মুখোমুখি হয়, একমাত্র ত্রাণকর্তা যিনি দক্ষতার সাথে খারাপ দুঃস্বপ্নদূর করেন তিনি হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার পরিচয় একজন প্রধানমন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার চেয়েও বেশি, তিনি একজন অদম্য সাহসী মানুষ। তিনি একজন যোদ্ধা এবং একজন অভিভাবক। তিনি সাহসের সাথে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা করেছেন। এখন তিনি বিশ্বের সেরা উদাহরণ এবং বিশ্ব নেতারা বৈশ্বিক সংকট পরিচালনায় তার উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

লেখক: একজন কলামিস্ট ও গবেষক।

অর্থনৈতিক সক্ষমতা রক্ষা যখন আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য

অর্থনৈতিক সক্ষমতা রক্ষায় এখন আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর পরবর্তীতে স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্লোগান তাতে করে এই সক্ষমতা বৃদ্ধির ধাপ আরো বেশি বেগবান হয়েছে। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রায় এক দশক পরে দেশের কৃষিখাতে কর্মক্ষম মানুষের অংশগ্রহণের পরিমাণ ৪৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। শুধু বিগত পাঁচ বছরে কৃষিখাতে এ সংখ্যা বেড়েছে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এরকম ভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাত নানাপরিক্রমায় এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে বেকারত্বের হার ও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে।

কৃষি বিপণন সহ বিভিন্ন সেবা খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যাবহারের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে অনেকেই নিত্য নতুন ব্যবসা ও ফ্রিল্যান্সীং এর আওতায় এসেছে। ফলে ঘরে ঘরের বাইরে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিবান্ধব প্রেক্ষাপট কে সামনে রেখে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ কে মাথায় রেখে বর্তমান সরকার ক্যাশলেস সোসাইটি বিনির্মাণে বদ্ধ পরিকর। এই সোসাইটির তৈরীর জন্য যে ধরনের ইকো সিস্টেম তৈরী করা প্রয়োজন তার জন্যও এই সরকার কাজ শুরু করেছে।

ক্যাশলেস সোসাইটির ধারনা নতুন কিছু নয়। বিনিময়ের অসংখ্য পদ্ধতির মধ্যে ক্যাশলেস বিনিময় মাধ্যম বর্তমানে বেশ আলোচিত ও গ্রহনযোগ্য। আজকের পটভূমিতে নগদহীন সমাজ বলতে বোঝায় প্রকৃত ব্যাঙ্কনোট, কয়েন বা চেকের পরিবর্তে ডিজিটাল তথ্য (সাধারণত অর্থের ইলেকট্রনিক উপস্থাপনা) মাধ্যমে পরিচালিত আর্থিক লেনদেন ।মূলত ক্যাশলেস বলতে বোঝায় নগদ অর্থবিহীন লেনদেন, যেখানে ক্যাশ বা নগদ অর্থ ব্যবহার ছাড়াই লেনদেন করা হয়। নগদবিহীন লেনদেনের মধ্যে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, মোবাইল অ্যাপসে পেমেন্ট, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং অন্য যেকোনো অনলাইন পেমেন্টে করা অর্থ আদান-প্রদানও অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশ বেশ কিছু সেক্টরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ক্যাশলেস ব্যবস্থা ব্যবহারের অনস্বীকার্য অনেক সুবিধা আছে যেমন ক্যাশলেসের ব্যবস্থার মাধ্যমে যেকোনো সময়, জায়গা থেকে সহজে ও দ্রুত লেনদেন সম্পন্ন করা যায়, ক্যাশলেস ব্যবস্থায় টাকা তৈরির খরচ কম আসে, অতিরিক্ত টাকা সঙ্গে না রাখার জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়, আর্থিক অপরাধ সংখ্যা কমে যায়, এ ব্যবস্থায় কর ফাঁকি দেয়ার সম্ভাবনা নেই, প্রতিটি লেনদেনের রেকর্ড রাখা সম্ভব, নকল বা জাল টাকার জালিয়াতি থেকে সুরক্ষিত, হাতে ধরা টাকাপয়সার আদান-প্রদান বন্ধ হওয়ার কারণে রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ কম থাকে এবং সর্বোপরি পরিবেশবান্ধব নগদবিহীন লেনদেন ব্যবস্থায় বিশ্বে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে সহায়তা করে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের অনেক সেবাখাত তাদের সেবাগুলোকে সহজতর করার জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে নগদবিহীন লেনদেন পরিচালনার জন্য সকল ব্যাংকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। এই বিবেচনায় ২০২১ থেকে ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে, তার একটা কাঠামো পরিকল্পনা বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করে ফেলেছে, যা জনগণের জন্য অন্যতম আশীর্বাদ বয়ে আনবে। এরই ধারাবহিকতায় সকল বানিজ্যিক ব্যাংক ও এসকল নির্দেশনা মেনে তাদের লেনদেন কে ডিজিটালাইজড করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। ক্যাশলেস উদ্যোগকে জনপ্রিয় ও প্রচলিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে যে, পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ, কার্ড বা চেক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নগদ অর্থে পরিশোধ ঝুঁকিপূর্ণ, চেকে পরিশোধ সময়সাপেক্ষ ও জটিল। অন্যদিকে কার্ড ব্যবহারের জন্য ব্যাংক বা এমএফএসগুলোকে ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো বিনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বিপুল বিনিয়োগ করতে হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় রাজধানীর একটি হোটেলে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেশন প্লাটফরম (আইডিটিপি) ‘বিনিময়’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, শতভাগ মানুষকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেবার আওতায় নিয়ে আসার অংশ হিসেবে ক্যাশলেস সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের লক্ষ্যের কথা বলেছেন। তিনি আরো

বলেছেন, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবারও জয়লাভ করে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে এবং আমাদের সরকারের পরবর্তী মেয়াদে তারা ক্যাশলেস সমাজে বাস করবেন যা এই সবরকারের স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নকে আরো বেশী ত্বরান্বিত করবে।

বর্তমানে মুঠোফোনের মাধ্যমে পরিচালিত আর্থিক সেবা বা এমএফএসে এখন প্রতি মাসে লেনদেন হচ্ছে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এ ছাড়া এটিএমে লেনদেন হয় প্রায় ২৯ হাজার ৫৪১ কোটি টাকা, পয়েন্ট অব সেলসে ২ হাজার ৬১৬ কোটি টাকা, ক্যাশ রিসাইক্লিং মেশিনে ৬ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা এবং ই-কমার্সে ১ হাজার ১৩০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, গত জানুয়ারিতে এসব সেবায় লেনদেন হয়েছে ১ লাখ ৫৯৩ কোটি টাকা। দিনে দিনে এসব সেবার ব্যবহার বাড়ছে, যা আনুষ্ঠানিক লেনদেনের আকারকে আরও বড় করছে। এর আগে গত বছরের এসব সেবায় লেনদেন প্রথম বারের মতো এক লাখ ৭ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছিল। মোবইল ব্যাংকিং সেবাটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে চালু হলেও এখন শহরে বসবাসকারী নাগরিকেরাও এর বড় ব্যবহারকারী। ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে এই সেবা এখন শুধু টাকা পাঠানো ও গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং বিল পরিশোধ, কেনাকাটা, মোবাইল রিচার্জ, টাকা জমানো, ঋণ গ্রহণসহ নানা ধরনের লেনদেন করা যাচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানের চেয়ে ৫-১০ গুণও বাড়তে পারে। ভবিষ্যতের এ অদম্য অগ্রযাত্রায় সবাইকে শামিল হতে হলে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। আমাদের জনসংখ্যার বিরাট অংশ তরুণ জনশক্তি। তাদের দক্ষ ও যোগ্য করতে পারলেই নতুন প্রজন্ম পাবে নতুন এক বাংলাদেশ।

উন্নত বিশ্ব প্রযুক্তি ব্যবহারে আজ যে পর্যায়ে এসেছে, তার কাজটা শুরু হয়েছিল আজ থেকে তিন দশক আগে। তারপরও এখন দেশ যে শতভাগ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে এমন দাবি করার সময় এখনো আসেনি। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক সময়েই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে বলেই সবার বিশ্বাস। এখন শুধু প্রয়োজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ উদ্যোগকে সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া। এ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের উচিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করা। তাহলেই খুব দ্রুতই স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় শামিল হবে বাংলাদেশ। এর ফলস্বরূপ

নির্মিত হবে ক্যাশলেস সোসাইটি। এর মাধ্যমে শত সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া স্বপ্নের এ সোনার বাংলা এগিয়ে যাবে বহুদূর।

লেখক: প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাঙ্গনে এখন সন্ত্রাস নেই কেন?

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দান করতে প্রয়োজন ছিলো সুশিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, যাতে ছোট্ট আয়তনের দেশটি অধিক জনসংখ্যার চাপ কিছুটা হলেও সামাল দিতে পারে।

তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া খাতগুলোর একটি হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাখাতটি গুরুত্ব পেয়েছিলো বলেই স্বাধীনতা অর্জনের ছয় মাসের মধ্যেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে গঠন করা হয় একটি কমিশনের।

গত দশ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ সমতা বিধানের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পগুলো ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।
অন্যদিকে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপবৃত্তির টাকা অনলাইনে প্রদান করেছে।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আর শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে রীতিমতো বিপ্লব ঘটেছে বাংলাদেশে যা, বিশ্বের বহু দেশের কাছে অনুকরণীয়। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগ, ছাত্র-ছাত্রীর সমতাসহ শিক্ষার অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই রোল মডেল এখন বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামসহ আন্তর্জাতিক দাতা ও গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশের শিক্ষার অগ্রগতিকে অন্যদের জন্য উদাহরণ হিসেবে অভিহিত করেছে। শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে বাংলাদেশ ছুঁয়েছে নতুন মাইলফলক।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ হওয়ায় বাংলাদেশ টেকশই ফল বয়ে এনেছে। লাখ লাখ শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা, নারী সাক্ষরতার মহার বৃদ্ধি মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। গড়ে ওঠে নতুন নতুন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। তবে ২০০৯ থেকে গত ১০ বছরে দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। দেশে নতুন ২২ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে বেসরকারি উদ্যোগে ৫২ টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে Accreditation Council আইন পাস করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ লাখে উন্নীত হয়েছে।

শিক্ষার গুনগত মান উন্নোয়ন ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি দেশের সার্বিক ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে। শিক্ষার কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক ডিজিটালাইজেশন হওয়ার কারনে শিক্ষাক্ষেত্রে দুনীর্তি রোধ হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ উন্নতি হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম আর নেই।

পূর্বে ‘শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস’ এই কথাটি জনগণের মনে ভীতির সৃষ্টি করতো। এক সময় ছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয় যেনো হয়ে উঠছিল রাজনৈতিক সন্ত্রাস এর স্থান, জামায়াত ইসলামি এবং বিএনপি যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিল তখন ছাত্রনেতাদের উদ্বত্ব যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশের জন্য হুমকিতে পরিণত হয়েছিল, সুষ্ঠুভাবে ক্লাস ও পরীক্ষাতো দূরের কথা ছাত্র-ছাত্রী/কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভীতির সমুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস যেন পরিণত হয়েছিল

সন্ত্রাসীদের স্থায়ী বাসস্থান।
সাধারণ ছাত্রদের কোন স্থান ছিলনা সেখানে।

কেউ যদি কোনদিন কিছু বলার সাহস করতো তাহলে তার হাত ও পায়ের রগ কেঁটে দিয়া হতো নিঃসংশ ভাবে, সর্বস্তরে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় মন্থর হয়ে পরেছিল।

বর্তমান সরকার তাদের সুদক্ষ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস মুক্ত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, এখন প্রতিটি বিভাগীয় শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষানীতি যেমন- ভর্তি করণ, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা বিভিন্ন জাটিল প্রক্রিয়াগুলি মানুষ নির্বিঘ্নে করতে পারছে। এখন আর নেতাদের চাপের মুখে পরতে হচ্ছে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম এখন সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হচ্ছে।

টেন্ডার জমা দেওয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পর্যন্ত অনলাইন এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এই সুযোগ গুলির কারণে এখন আর সন্ত্রাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান পাচ্ছে না।

অধ্যাপক ড. হিমাংশু ভৌমিক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

জনগণ কি আগুন সন্ত্রাস চায়?

বৈশ্বিক মন্দাবস্থা, যুদ্ধাংদেহী আবেশের মোড়কে চলমান আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, সদ্য প্রয়াত করোনা মহামারীর প্রবল আঘাতসহ নানান প্রতিকূলতাকে তোয়াক্কা না করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত এক যুগে বাংলাদেশের উন্নয়নের মহাসোপান যেখানে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে একটি উন্নত স্মার্ট বন্দরে সফল নোঙরের উদ্দেশ্যে, সেখানে এই অদম্য যাত্রাকে বাঁধা দিতে আবারো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে স্বাধীনতাবিরোধী, জঙ্গিগোষ্ঠীর মদদদাতা,

এবং সন্ত্রাসীগোষ্ঠী হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিএনপি-জামায়াত রাজনৈতিকি গোষ্ঠী। যেখানে চলমান আওয়ামী লীগ সরকার ‘ডিজিটাল’, ‘স্মার্ট’, ‘ভীশন’, ‘টেকসই উন্নয়ন’, ‘রূপকল্প – ২০৪১’, ‘ডেল্টা প্ল্যান – ২১০০’, ‘মহা প্রকল্প’, ‘উন্নয়নের মহাসড়ক’ ইত্যাদি ইতিবাচক শব্দগুচ্ছকে সোনার বাংলার অভিধানে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে আরেকটি দল ইতিবাচক কোন কিছু উদ্ভব করায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় তো দিয়েছেই বরংচো বাংলার মানুষকে পরিচিত করেছে ‘আগুনসন্ত্রাস’ নামক একটি চরম নেতিবাচক শব্দের!

গত এক যুগে তিন দফায় নির্বাচিত আওয়ামীলীগ সরকারের সুদক্ষ পরিকল্পনায় দক্ষিন এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক হাব হয়ে ওঠা এই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বদ্বীপটির জনগন আজ সেই সব স্বপ্নগুলোর বাস্তব চাক্ষুষ সাক্ষী হতে পেরেছে যা হয়তো একসময় ছিল কল্পনার অতীত। আজ বাংলাদেশ এর রয়েছে দেশের দীর্ঘতম ও বিশ্বের গভীরতম পিলার বিশিষ্ট পদ্মা সেতু, দক্ষিন এশিয়া তথা দেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গপথ কর্ণফুলী টানেল, দেশের প্রথম পরমানু ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেল, উড়াল সড়ক, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ আরও অনেক মহাপ্রকল্প। যেখানে ২০০৯ এ মাত্র ৪৭ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ এর আওতাভুক্ত ছিল সেখানে আজ শতভাগ মানুষ পাচ্ছে বিদ্যুৎ সুবিধা, নতুন রেলপথ নির্মিত হয়েছে ৪৫১ কিলোমিটার, পুনর্বাসিত হয়েছে আরও ১ হাজার ১৮১ কিলোমিটার রেলপথ, নির্মিত হয়েছে ৪০০ এরও বেশী রেলসেতু। এছাড়াও দেশে এক যোগে উদ্ভোদন করা হয় ১০০ এরও বেশী সড়ক সেতুর। এতসব উন্নয়নের যাত্রায় আজ মানুষ সন্ত্রাসী বিরোধী দলের ডাকা কোন হরতাল, অবরোধ, নাশকতা কিংবা অগ্নিসন্ত্রাস চায় না।

দেশের এই দুর্বার এগিয়ে চলার পথে বাঁধা দেয়ার জন্য সেই শুরু হতেই জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি-জামায়াত জোট চালিয়ে যাচ্ছে হরতাল অবরোধের নামে তাদের আগুন সন্ত্রাস। জোটটি জানে বাংলার মানুষ তাদের অরাজকতা আর সহ্য করতে চায় না, তাই তারা বেছে নিয়েছে নৈরাজ্যের পথ। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ভয়ানক আগুনকে।

মূলত ২০১৩ হতে সূচিত হয় বিএনপি জামায়াত জোটের এই আগুন নিয়ে খেলা যার বিভীষিকার কথা ভুলে যায় নি বাংলার জনগন। সে সময় যারা কখনও চায় নি বাংলাদেশ নামক একটি ভূখন্ড হোক, সেই ঘাতক, পিশাচ, যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে দলটি প্রায় ৪১৯ টি পৃথক ঘটনায় ১৫ জন

পুলিশ সদস্য সহ হত্যা করে ৪৯২ জন নিরপরাধ মানুষকে। এ সকল অগ্নিসংযোগ, সংঘর্ষ ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডে আহত হয় প্রায় আড়াই হাজারের মত মানুষ। এরপর ২০১৪ সালের নির্বাচন কালীন সময়ে তারা দেখায় তাদের ভয়ংকরতম রূপটিকে।

এসময় তারা আগুন ধরিয়ে দেয় সারাদেশের প্রায় ৫৮২ টি ভোটকেন্দ্রে, শত শত যানবাহনে, রাস্তার পার্শবর্তী বৃক্ষরাজিতে, এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসানালয়ে। নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় যেনে তারা পেট্রোল বোমায় পুড়িয়ে মারে বহু নিরপরাধ সাধারন জনগনকে। অগ্নিদ্গধ অসহায় মানুষদের কান্নার আহাজারিতে প্রকম্পিত হতে থাকে সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালগুলো। নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার সহ এই সন্ত্রাসী জোট গোষ্ঠী হত্যা করে ২৬ জন মানুষকে। একবছর পর ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারী যখন আওয়ামী লীগ সে মেয়াদ কালের তাদের প্রথম বর্ষ উদযাপন করছিল, সেদিনও আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আগুন সন্ত্রাসেরা। সেসময় ২ হাজার ৯০৩টি বাস-ট্রাক, ১৮টি ট্রেন, ৮ টি যাত্রীবাহী লঞ্চ, ৭ টি ভূমি অফিসসহ ৭০ টি সরকারি অফিসে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে মারে সন্ত্রাসী সংগঠনটি। এসব ঘটনায় নিহত হয় ২৩১ জন মানুষ এবং গুরুতর আহত হয় ১ হাজার ২ শত মানুষ। এরপর থেকেই পুরোপুরিভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বিএনপি-জামায়াত জোট গোষ্ঠী। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায় সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে। সর্বশেষ চলতি বছরের ১৫ জুন কানাডার টরেন্টোর আদালতে এক মামলায় বিএনপিকে ৫ম বারের মত সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এতকিছুর পড়েও আগুন নিয়ে খেলা পুরোপুরি শেষ হয় নি দলটির। ২০১৯ সালের ১২ নভেম্বর ঢাকায় উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর ডাকা সমাবেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে অগ্নি সংযোগ ঘটায়। কিন্তু বাংলাদেশের সচেতন জনগন তাদের এসব নৈরাজ্য ও অরাজকতাকে তুমুলভাবে প্রত্যাখান করে। বাংলাদেশের মানুষ এখন এগিয়ে যাওয়ার পথে, তারা শুধু স্বপ্ন দেখে উন্নত এক ভবিষ্যৎ এর। এই পথে এই দেশের জনগন কখনো মেনে নেয় নি এবং মেনে নেবেও না আগুন সন্ত্রাসকে।

লেখক: অধ্যাপক, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সাইন্স বিভাগ এবং প্রক্টর, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়।

পর্যটনের নতুন দিগন্তে পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতুতে রেল চলাচল শুরু হওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগের নবদিগন্ত উন্মোচিত হলো এবং বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়েছে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে এলাকা। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল করছে। পর্যটন সম্ভাবনার বৃহৎ উৎসস্থল হলো পদ্মা সেতু।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাংলার মানুষের বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণের অনন্য উদাহরণ। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর জেলার জাজিরাসহ দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক যোগসূত্র স্থাপন হবে।

এই যোগসূত্র স্থাপনের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশের অনন্য অবদান রাখবে। পদ্মা সেতু দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পদ্মা সেতুর দুই পাড় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক পদ্মার দুই পাড়ে নান্দনিক সৌন্দর্য দেখার জন্য ঘুরতে যায়। মাওয়া ও শরীয়তপুর প্রান্তে রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, হোটেল-মোটেলসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে তিনটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে তন্মধ্যে ষাট গম্বুজ মসজিদ ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন এই দুইটি হেরিটেজ দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত তবে অতীতে ওই অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক পর্যটকদের পছন্দের পর্যটন কেন্দ্র হওয়া স্বত্বেও ভ্রমণে আগ্রহ ছিল কম। পদ্মা সেতুর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলোতে ভ্রমণে আগ্রহ বাড়বে।

পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত

স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন বাস্তব। ঢাকার সাথে মংলা বন্দর, বরিশাল, কুয়াকাটা, পায়রা বন্দর, খুলনা, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার অর্থনৈতিক খাতে এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

এই পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৩ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। দেশের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর ভূমিকা নিয়ে এর আগে বিশ্বব্যাংক বলেছিল, সেতু বাস্তবায়িত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে যাবে। আর প্রতি বছর দারিদ্র্য নিরসন হবে শূন্য দশমিক ৮৪ ভাগ।

দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলোর মধ্যে ভাসমান পেয়ারা বাজার, ঐতিহাসিক দুর্গা সাগর, কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট, খান জাহান আলী সেতু, খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, জাতিসংঘ পার্ক, দক্ষিণডিহি রবীন্দ্র কমপ্লেক্স, বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের মাজার, রূপসা নদী, শহীদ হাদিস পার্ক, খানজাহান আলী কর্তৃক খননকৃত বড়দীঘি, খুলনা শিপইয়ার্ড, গল্লামারী স্মৃতিসৌধ ও বধ্যভূমি, জাহানাবাদ বনবিলাস চিড়িয়াখানা ও শিশুপার্ক, পিঠাভোগ, প্রেম কানন বকুলতলা, মংলা পোর্ট, রাড়ুলী, রেলস্টেশনের কাছে মিস্টার চার্লির কুঠিবাড়ি, সোনাডাঙ্গা সোলার পার্ক ও অন্যান্য পর্যটন আকর্ষণগুলোর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

পর্যটকেরা কুয়াকাটা সমুদ্রের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং খুব কম সময়ে সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণীয় স্পট-কচিখালী, কটকা সৈকত, জামতলা সী-বিচ, সুন্দরবন সংলগ্ন সাগরে জেগে ওঠা দ্বীপ পক্ষীর চর, ডিমের চর ঘুরে দেখার অপার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন, পায়রা বন্দরকে ঘিরে পর্যটন সম্ভাবনার নতুন দ্বার খুলবে পদ্মা সেতু এবং মাত্র ৬ ঘণ্টায় উপরের উল্লেখিত পর্যটন আকর্ষণগুলোতে পর্যটকেরা যেতে পারবে।

অন্যদিকে কুয়াকাটার গা ঘেঁষে অবস্থিত ফাতরার চর, লাল কাকড়ার চর, শুঁটকি পল্লী, লালদিয়ার চর, চর বিজয়, ফকিরহাট, সোনার চর, ক্র্যাব আইল্যান্ড বা কম কী? একটি স্পট থেকে আরেকটি স্পট নান্দনিক এছাড়াও রয়েছে ভিন্ন রকম জীব-বৈচিত্র্যর সমারোহ। দারুণ সময় কাটাতে চাইলে এসব পর্যটন স্পটের জুড়ি পাওয়া কঠিন। রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা স্বল্প সময়ে পণ্য পরিবহন করে মংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি গতিশীল হবে এবং রপ্তানি

আয় বৃদ্ধি হবে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত (যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকন করা যায়), ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন সংলগ্ন ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে মালদ্বীপের ন্যায় পর্যটন আকর্ষণ তৈরি করা সম্ভব এবং সুন্দরবন ঘিরে ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম উন্নয়নের অনন্য সুযোগ রয়েছে।

প্রতিবছর পর্যটকবাহী ৪৫টি ক্রুজ ভারতে কুচবিহার-চেন্নাই-গোয়া হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারে চলে যায়। তবে এই ক্রুজগুলো যদি পায়রা বন্দরে আকৃষ্ট করা যায় তবে আন্তর্জাতিক পর্যটক উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। পদ্মা সেতু গতিশীল করবে মংলা ও পায়রা বন্দরকে যা সুনীল অর্থনীতিতে অনন্য অবদান রাখবে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল যেমন কুয়াকাটা, মংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর কেন্দ্র করে সমুদ্র পর্যটনের সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। নদীভিত্তিক ও সমুদ্রভিত্তিক পর্যটনে সময়োপযোগী সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের পাশাপাশি তৈরি করবে কর্মসংস্থান সুযোগ, শক্তিশালী হবে জাতীয় অর্থনীতি। তবে আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণের জন্য পদ্মা সেতুর ও দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলো ছোট ছোট প্রমো তৈরি করে ডিজিটাল ব্র্যান্ডিং করা প্রয়োজন।

লেখক: চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের অবদান

বাংলাদেশ আমাদের কাছে মাতৃস্বরূপ। বরাবরই এদেশের স্তন্যদায়ী গ্রামীণ প্রকৃতির আলো-বাতাস-জল এসবের লালিত্যে বাঙালির দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রাম বাংলা আমাদের জীবনে নিউক্লিয়াসের সমতুল্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশ একদিকে যেমন অপরূপ সৌন্দর্যের উৎস, তেমনি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের অন্যতম সরবরাহকারী ক্ষেত্র। আজ

শহরায়নের ফলে মানুষ অনেকবেশি শহরমুখী। জীবন ও জীবিকার তাগিদে সকলে শহরপানে ছুটে চলেছে। তাই শহরের ওপর চাপ বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল।

কিন্তু শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আজ টেকসই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বাংলাদেশে মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির সম্প্রসারণের ফলেই দেশে আজ উন্নতির সুবাতাস বইছে। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গ্রাম অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন; গ্রামে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় আধুনিক উপকরণের সহজলভ্যতা; শিক্ষা, চিকিৎসা ও বৈদ্যুতিক খাতে অভাবনীয় উন্নতি সাধন; পাশাপাশি উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি গ্রামে সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে গ্রাম বাংলার জনজীবনের সংযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নিরলস পরিশ্রমের ফলে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশে আজ উন্নতির নৌকা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অবিরাম ছুটে চলেছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেলের মতো মেগাপ্রকল্প শেখ হাসিনা সরকারের হাত ধরে জাতির পিতার সোনার বাংলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে, শেখ হাসিনা সরকারের নেতৃত্বের সুনাম বর্তমানে জাতীয় পর্যায়কে জয় করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে শহর অঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামীণ বা তৃণমূলে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পাশাপাশি গ্রামের কাঁচা-মেঠোপথ পাকাকরণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে শেখ হাসিনার সরকার।

বর্তমানে বাংলাদেশে শহর কিংবা গ্রাম উভয় পরিবেশে জীবনযাত্রার মান প্রায় সমান। শেখ হাসিনার সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলার গ্রামও আজ শহরের মতো আধুনিকতার স্পর্শতায় পরিপূর্ণ। শেখ হাসিনা সরকার বরাবরই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করেছে। দেশের উন্নয়নের অভিযাত্রায় ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ সংযোজনটি গ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে ব্যাপক শক্তিশালী ভিত দান করেছে। আর বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের উন্নত জীবনযাপন ও দেশের শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতি বিনির্মাণের একমাত্র দাবিদার শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার নিঃসন্দেহে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলো প্রেতাত্মারা। কিন্তু শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও আওয়ামী লীগ সরকার জনগণকে আজ সেই কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ প্রদান করেছে। বৈশ্বিক ও জাতীয় সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। শেখ হাসিনা সরকারের অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব। ফলে বর্তমানে দেশে উন্নয়নের সুফল সকলে পাচ্ছে এবং আয়ের বৈষম্য কমে মানুষের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে শেখ হাসিনার সরকার গ্রাম অঞ্চলে উন্নত রাস্তাঘাট, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ, গ্রামে গৃহহীনদের জন্য সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের মতো কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলে আধুনিক জীবনযাপনের সকল উপকরণ নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র ও যান্ত্রিকায়ন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামে পর্যাপ্ত কর্মস্থাপনের ব্যবস্থা করে শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করে তুলেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সঠিক নেতৃত্বে আজকে প্রতিটি গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা কিংবা জেলা একসূত্রে যুক্ত।

গ্রাম ও শহর উভয়ের ব্যাপক উন্নয়ন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে সমবায় পন্থায় সৃষ্ট বাংলাদেশের সমৃদ্ধ জাতীয় অর্থনীতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সফলতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নকে সমুন্নত রাখতে এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে আসন্ন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বের বিকল্প নাই। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতার মুজিবীয় আদর্শে বিশ্বাসী বাংলাদেশের আপামর জনগণ আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বকে পুনরায় বিজয়ী করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমুন্নত রাখবে নিঃসন্দেহে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমার বাড়ি আমার খামার: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিন বদলের হাতিয়ার

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নত মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে কৃষি খামারের ভূমিকা অপরিসীম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৫ এবং ১৬ অনুযায়ী প্রতিটি পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করতে বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর সূচিত পথ ধরে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় এসে দরিদ্র মানুষের জন্য ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের একটি ধারণা তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. রহমত আলীকে প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন তখন দেশের সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেমকে ব্যবহার করে প্রতিটি গ্রামের বাড়িতে কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে কার্যকর খামারবাড়ি হিসেবে গড়ে তোলা। এই ধারণার কার্যকারিতা পরীক্ষা করার লক্ষ্যে প্রথমে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনা করে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ধারণাটি পরিবার পর্যায়ের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা আয় সঞ্চারণে বেশ কার্যকর।
এই প্রেক্ষাপটে একনেক কর্তৃক জুলাই ২০০০ সাল থেকে জুন ২০০৫ মেয়াদের জন্য ১৪১০৮.০২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হয়। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হলে তৎকালীন সরকার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়।

২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুনরায় সরকার গঠন করলে আমার বাড়ি আমার খামার নামে প্রকল্পটি আবার কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠনের ফলে প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ ২০২১ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পল্লী এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি ও স্থায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন করা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গঠিত তহবিল পারিবারিক বলয়ে আয়বর্ধক কৃষিজ খামার স্থাপনে বিনিয়োগ করা এবং জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় একেকটি গ্রাম থেকে ৬০টি দরিদ্র পরিবার নির্বাচন করে ৪০ জন নারী এবং ২০ জন পুরুষ নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির সদস্যরা মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন। সদস্যদের সঞ্চয় জমা একনাগাড়ে ২৪ মাস পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। ৬০ জন সদস্য ২৪ মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করলে দুই বছরে ২.৮৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয়।

সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প থেকে সমপরিমাণ অর্থ (সদস্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা হারে ২৪ মাস) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র সদস্যদের তাদের কষ্টার্জিত দৈনন্দিন আয় থেকে সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে।

এছাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য প্রকল্প থেকে প্রতি সমিতিতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে দুই বছরে ৩ লাখ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিজেদের সঞ্চয় ও প্রকল্প থেকে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদানের সাথে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান যোগ হয়ে প্রতি সমিতির জন্য দুই বছরে ৯ লাখ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে ওঠে।

এই অর্থের মালিক সমিতি। সমিতির সদস্যরা এই অর্থ স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক খামার করতে ব্যবহার করে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্যদের দক্ষ খামারি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে বাস্তবায়িত ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের অধীনে মোট গ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে ১,২০,৩২৫টি। দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০৮৬ কোটি টাকা। গ্রাম সমিতির জন্য মোট তহবিল গঠিত হয়েছে ৭৬০৯ কোটি টাকা। সদস্যদের বাড়িতে পারিবারিক খামার স্থাপিত হয়েছে ৩৩ লক্ষ ৩৭ হাজার।

এটি এখন স্বীকৃত যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয়

দর্শন ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে একদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যেমন বিপুল পরিমাণ তহবিল স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তেমনি অপরদিকে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দরিদ্রতার হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে এবং অতি দরিদ্রতার হার হ্রাস পেয়ে এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হয়েছে। যারা পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা বহির্ভূত ছিল, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এইসব পরিবারদের ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করেছে, যা বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে।

ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিকল্প ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ হয়ে উঠেছে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিন বদলের হাতিয়ার।

লেখক: সার্জারি এন্ড থেরিওজেনোলজি বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

সংলাপ নয় সংঘাতেই বিএনপির ভরসা

রাজনীতির মাঠে সংলাপ শব্দটি আবারও ঘুরতে শুরু করেছে। বহুল আলোচিত ২৮ অক্টোবরের পর এবার শর্তহীন সংলাপের বিষয়টি সামনে এনেছেন আরেক আলোচিত কূটনীতিক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির সহিংসতার পর মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস হরতাল অবরোধের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন ভবনে গিয়ে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালের সাথে বৈঠক করলেন। যদিও বৈঠকটি পূর্ব নির্ধারিত ছিলো না। সিইসির সঙ্গে বৈঠক সেরে বেরিয়ে এসে নিজেই সাংবাদিকদের সামনে এসে কথা বললেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুরোনো কথাগুলো বললেন। শেষ দিকে এসে বললেন গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কোনো পক্ষের রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। তার আশা সব পক্ষ শর্তহীনভাবে সংলাপে বসে সামনের দিকে এগোবে। পিটার হাসের সাথে সুর মিলিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরাও শর্তহীন সংলাপের

বিষয়টি আলোচনায় এনেছেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতও সরকারের মন্ত্রীদের সাথে দেখা করে শর্তহীন সংলাপের প্রসঙ্গটি তুলেছেন।

এতো গেলো মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও তাদের সঙ্গী সাথীদের কথা। এখন প্রশ্ন হলো বিএনপি কি সংলাপে বিশ্বাসী? এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না এরকম এককথায় না দিয়ে একটু বিশ্লেষণে আসা যাক। দলটি কখনোই যে কোনো সংলাপ করেনি তা কিন্তু নয়। তারা যে সংলাপগুলো করেছে তা সফল হয়নি কারণ তারা সব সময়ই শর্ত জুড়ে দিয়েই আলোচনার টেবিলে যেতে চায়। আমরা ২০০৬ সালে আব্দুল জলিল ও মান্নান ভূঁইয়ার সেই সংলাপের কথা কিন্তু আমরা ভুলে যায়নি। সংলাপটি কেনো ভেস্তে গিয়েছিলো তা কিন্তু পরে আমরা পরিস্কার হয়েছি। দুই নেতাই সে সময় প্রায় একটা সমাধানে চলে এসেছিলেন কিন্তু খালেদা জিয়ার গ্রিন সিগন্যাল না থাকায় সেসময় দুজনের সংলাপটি ভেস্তে যায়। তার পরের রাজনীতির চিত্র আমরা দেখেছি।

২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে ফোন করে আলোচনার জন্য ডেকেছিলেন। খালেদা জিয়া সেসময় সাড়া দেননি। এরপর তো সবাই জানেনই বিএনপি তার সঙ্গী স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতকে সাথে নিয়ে অবরোধের নামে বেছে নিলো আগুন সন্ত্রাসের পথ। বহু নিরপরাধ মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীরা।

২০১৮ সালেও ড.কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি জোট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সংলাপে বসেছিলো। তারা সেই নির্বাচনেও অংশ নিয়েছিলো। এক একটি আসনে একাধিক প্রার্থী দেয়ার পাশাপাশি মনোনয়ন বাণিজ্য সামনে আসায় নির্বাচনের পর থেকেই শুরু হয় মিথ্যাচারের রাজনীতি।

এবার আসা যাক সাম্প্রতিক পরিস্থিতির দিকে। শর্তহীন সংলাপের কথা পিটার হাসই যে নতুন বললেন তা কিন্তু নয়। ২৮ অক্টোবর বিএনপির তাণ্ডবের আগে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব না দিলেও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শর্তহীন সংলাপের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিএনপি একেবারে শুরুতেই তা নাকচ কেও দেয়। মির্জা ফখরুল সাহেব থেকে শুরু করে দুদু-রিজভীরা শর্তজুড়ে দিয়ে বলতে থাকলেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগ, নির্দলীয় সরকার মানলেই কেবল সংলাপ। এভাবে শর্ত দিয়ে কি সংলাপ হয়? আপনারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ চান তাহলে সংলাপ করবেন কার সাথে?

এবার আরেকটু পিছনের দিকে যাই গত বছরের জুলাই মাসে নির্বাচন কমিশন

রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও অংশীজনদের সাথে সংলাপে বসেছিলো। কিন্তু বিএনপি সে সংলাপে যায়নি। শুধু বিএনপিই নয় তাদের সমমনা দলসহ ৯টি দল সংলাপে যায়নি। এমনকি ইসি গঠনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংলাপে এর আগে দু’বার গেলেও শেষবার তারা গর হাজির। তাদের অভিযোগ ছিলো ইসি গঠনে তাদের কোনো মতামতই নাকি রাখা হয়না। যদিও বর্তমান সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালের নামের প্রস্তাবক বিএনপিরই ঘনিষ্ঠ প্রয়াত ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

এবার আবারো আসি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে। হাস সাহেবরা সংলাপের প্রসঙ্গটি সামনে আনার পর ঠিক সংলাপ আকারে না হলেও নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছে তাদের প্রস্তুতি জানাতে। কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে এজন্য আগেভাগেই চিঠিও পাঠিয়েছে। বিএনপির চিঠি পৌঁছেছে পল্টনের কার্যালয়ে। তবে সেখানে চিঠি সংগ্রহ করার মতো কেউ ছিলেন না। চিঠিটি পড়ে আছে কলাপসিবল গেটের ভিতরে একটি চেয়ারে। চিঠি যাওয়ার খবর শুনে অজ্ঞাত স্থান থেকে রুহুল কবির রিজভী বরাবরের মতোই এ নির্বাচন কমিশনের আলোচনায় যাবেন না বলে জানিয়ে দেন।

এতোদিন বিএনপি যাদের ওপর নির্ভর করেছিলো, যে পিটার হাসকে অবতার ভাবতে শুরু করেছিলেন বিএনপির নেতারা এখন তার প্রস্তাব করা সংলাপেও ভরসা রাখতে পারছে না দলটি। আসলে দলটি কি চায়? তারা তো সংলাপ চায় না। সংলাপ চাইলে কি ২০১৪ সালে খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার সংলাপের প্রস্তাবটি অসৌজন্যমূলকভাবে প্রত্যাখান করতে পারতেন?

বিএনপি তার পুরোনো অবস্থান থেকে একচুলও সরেনি। সংলাপে নয় অবরোধের আগুনেই ভরসা রাখছে তারা। বিএনপি যে সহিংস সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে তার প্রমাণ তারা প্রতি পদে পদেই দিচ্ছে। আসলে তারা কোনোকালেই জনতায় ভরসা রাখতে পারেনি। তারা চিনেছে শুধু ক্ষমতা তাও আবার পেছনের দরজা দিয়ে। মিলিটারি ডিক্টেটর জিয়াউর রহমান পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে বিএনপির জন্ম দিয়েছিলেন। হ্যাঁ- না ভোট, ২০০১ সালের কারচুপির নির্বাচন, ২০০৭ সালে ক্ষমতা ছাড়তে টালবাহানার পর এখন সহিংসতার পথে রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষমতা চায় দলটি।

বিএনপিকে বলবো যাদের ওপর আশা করে আছেন, যাদের মুরুব্বি মেনেছেন, যাদের প্রভু ভাবছেন তাদের কেউই আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারবে না। তাই আগুন সন্ত্রাসের পথ ধরে ক্ষমতায় যাওয়ার আশা ছেড়ে জনতায় ভরসা রাখুন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো- দলটি কি পারবে লন্ডনি প্রেসক্রিপশন থেকে বেরোতে? যদি না পারে তাহলে ওই

প্রবাদটিই সত্য বলে ধরে নিতে হবে ‘চোরাই না শোনে ধর্মের কাহিনী’।

লেখক: সাংবাদিক ও সাবেক ছাত্রনেতা।

সাবধান! চারদিকে বিদ্বেষ…

এই লেখাটি লিখতে বসে উগ্র জাতীয়তাবাদ চর্চার প্রবর্তক অ্যাডলফ হিটরারের তথ্যমন্ত্রী গোয়েবলসের সূত্রটি খুব মনে পড়ছে। মিথ্যাকে সত্য বানানোর একটি সূত্র দিয়েছিলেন তিনি। এই সূত্র অনুসরণ করা সভ্যতা বিবর্জিত, সন্দেহ নেই। কিন্ত এটি যে খুব সত্য সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি বলেছিলেন একটি মিথ্যা বার বার বলতে থাকলে তা এক সময় বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে। একটি মিথ্যা বার বার বলে সত্য বানানোর একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ আমাদের সবার সামনে এই মুহূর্তেই আছে। কিন্তু সেটি আপাতত মনে করিয়ে দিচ্ছি না। শুধু বলছি, এখন আমাদের চারদিকে বিদ্বেষ। আমারা বিদ্বেষের সাগরে ডুবে যাচ্ছি।

বলছি বর্তমান সময়ের কথা। আজ থেকে ২০ বছর আগে হলে হয়তো কোন বিদ্বেষ সামনে আসলে বেশিরভাগ মানুষ সেটা বিচার বিবেচনা করে, ধরে ফেলতে পারতো। তিনি হাতে সময় পেতেন। কিন্ত এর এখন পরিমাণ এতি বেশি যে, মানুষ নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করার সময় পাচ্ছে না। একটা ঘটনা আসতে আসতে আরেকটা চলে আসে। তিনি কোনটা রেখে কোনটা বিবেচনায় আনবেন? তাই তিনি এখন ভাবেন, এত বিচার বিবেচনায় যাওয়ার চেয়ে ঘটনা শুনে ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্ত কোন ঘটনা শোনার পর পুরোপুরি ভুলে আসলে যাওয়া যায় না, মনে একটা ছাপ কিন্তু থেকেই যায়। আর এভাবেই তিনি হাজারটা বিদ্বেষের অন্ধকারে ডুবে যান।

এই বিদ্বেষ নিয়ে জাতিসংঘের একটি ওয়েব পেজে সবচেয়ে কার্যকর কথাটি বলেছেন, জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। তিনি সেখানে বলেন, মানুষ ইন্টারনেটে অভ্যস্ত হওয়ার পর সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানোর মাত্রা বেড়েছে। এটি এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনের অন্যতম ঝুঁকি। কারণ প্রথাগত গণমাধ্যমের চেয়ে অনলাইলইনে বিদ্বেষ ছড়ানো

অনেক সহজ। পদ্ধতির কারণে এখানে একটি বিদ্বেষ বার সামনে আসতে পারে এবং বার বার বহু মানুষকে এর সঙ্গে জড়াতে পারে। অনলাইনে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যে, তিনি বার বার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং মনিটরিং এর সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

এই ওয়েব পেজেই বলা হয়, বিশ্বব্যাপী ইস্যুটি মোকাবেলা করার জন্য জাতিসংঘ বিদ্বেষ বার্তার একটি কাঠামো দিতে চায়। এরইমধ্যে তারা কোন ধরণের বার্তা বিদ্বেষ হিসাবে চিহ্নিত করবে, সেব্যাপারে একটি প্রাথমিক ধারণা দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সেটাই হচ্ছে বিদ্বেষ বার্তা, যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কা থাকে। সেই বক্তব্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেমন হতে পারে, আবার হতে পারে কোন গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নামেও। কোন আচরণ, বক্তব্য বা লেখায় আক্রমণ বা অবমাননাকর বা বৈষম্যমূলক ভাষা ব্যবহার করলেও সেটা বিদ্বেষ বার্তা হিসাবে বিবেচিত হবে।

আজ অবধি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে বিদ্বেষ বার্তার কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা তৈরি হয়নি। বিষয়টি নির্মাণের পর্যায়ে আছে। তাই আপাতত জাতিসংঘের আভাস ধরে আমরা বলতে পারি, যে বার্তায় সমাজের শান্তি নষ্ট হয় সেটাই বিদ্বেষ বার্তা। মূল বিষয় বিষয় হচ্ছে শান্তি ভঙ্গ। কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে একই রকম বার্তায় একটি সমাজে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে আবার আরেকটি সমাজে নাও হতে পারে। মূল বিষয় হচ্ছে সমাজ বুঝে বার্তাটি ছড়ানো।

সমাজ বোঝার প্রসঙ্গ আসলেই পরিকল্পনার প্রসঙ্গটি চলে আসে। আর কোন একটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই কেবল মানুষ সময় দিয়ে, অর্থ দিয়ে সমাজ বোঝে। আর সেই উদ্দেশ্য যদি অসৎ হয় তাহলেই বলতে হবে ছড়ানো বার্তাটি বিদ্বেষ বার্তা। এখন আমরা মোটামুটি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, অসৎ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোন বার্তা ছড়ানো হলে সেটাকে আমরা বিদ্বেষ বার্তা বলবো।

যাই হোক, গুতেরেস এবং জাতিসংঘের প্রসঙ্গ এই লেখায় আনলাম কারণ, তারা কথা বলছিলেন, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে বিদ্বেষ বার্তার অ্যাকাডেমিক আলোচনাই ছিল মুখ্য। আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাধান হিসাবে তাঁর সেটাই করার কথা। তিনি কোন সমস্যা সমাধান করতে চাইলে আগে কাগজে কলমে করবেন। তার পর সমাজে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি যদি এই বিদ্বেষ বার্তার সামাজিক প্রভাব কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা দেখতে চাইতেন তাহলে তার বাংলাদেশের

দিকে মনোযোগ দেয়া দরকার ছিল।

খুব মোটা দাগে বিদ্বেষ ছড়ানোর একটি উদ্যোগ সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে বাংলাদেশে। যে কারণে পরিকল্পনাকারীরা সেই বিদ্বেষের সবটা ছড়াতে পরেনি। কিন্তু বিদ্বেষ বার্তা ছড়ানোর দু’জন মানুষ চিহ্নিত হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে আমার লেখার উদ্দেশ্য সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানোর কুফল সম্পর্কে বলা। যে কারণে সেই চিহ্নিত দু’জন মানুষের নাম এবং নির্দিষ্ট কাজের কথা উল্লেখ করছি না। তার দরকারও নেই। কারণ এরই মধ্যে প্রচলিত গণমাধ্যমে এসব বিস্তারিত এসেছে।

এখন বলা যায় পরিকল্পিতভাবে তারা একটি চূড়ান্ত বিদ্বেষ প্রচার করতে চাচ্ছিলেন। যেটা একটি দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে সত্য মনে হয়। যার ওপর ভর করে একটি রাষ্ট্রের সরকারের মত একটি প্রতিষ্ঠান উৎখাত হতে পারে। এরই মধ্যে প্রকাশ্য হয়েছে যে, তারা এই কাজটি করার জন্যে দির্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষের মন ও মনন বিশ্লেষণ করেছেন। অতঃপর বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যে মাঠে নেমেছেন। এখানে তাদের বিদ্বেষ ছড়ানোর আরও উদাহরণ দেয়া যেতো। সেটা প্রাসঙ্গিকও হতো। কিন্তু সেই ছোট্ট গবেষণাটি আমার পাঠকের জন্যেই রেখে দিলাম। কারণ তার হাতের কাছেই ইন্টারনেট। আমি যা দেবো, এক ক্লিকেই তিনি তার ১০গুণ বেশি দেখে নিতে পারবেন।

যাই হোক। যে কেউ একটি সরকার বা মত, দর্শন কিম্বা ব্যক্তির বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারেন। লিখে, বলে, অবস্থান নিয়ে বা যে কোন উপায়ে এর প্রতিবাদ করতে পারেন। তিনি তার মতের পক্ষে জনমত গঠন করতে পারেন। খুব কড়া যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে সমালোচনা করতে পারেন। ধরা যাক একটি রাজনৈতিক দল একটি দেশের সরকার পরিচালনা করছে। পরিচালনা করতে গিয়ে তারা কিছু অনিয়ম করছে। যার প্রভাবে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। কেউ যদি এর সালোচনা করতে চান, তাহলে তিনি সেই অনিয়ম নিয়ে কথা বলবেন। নিয়মটা কী হওয়া উচিত সেটাও বলবেন প্রকাশ্যে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের মত প্রতিষ্ঠায় তারা আর যাই করুণ বিদ্বেষ ছড়াতে পারবেন কী? কারণ বিদ্বেষ ছড়ালেই তো প্রশ্ন উঠবে কাজটি তিনি কেন করছেন? উদ্দেশ্য কী? নানা আপত্তি উঠবে। গুতেরেসের এত কথা বলার পর সেই আপত্তি, আর কারও ব্যক্তিগত আপত্তি নেই। হয়ে গেছে সভ্যতা রক্ষার আপত্তি। পাঠক ভাবুন, বিদ্বেষের মত ভয়ঙ্কর বিষ ছড়ানোর দরকার হয় কখন? যখন একটি সত্যের ওপর মিথ্যার প্রলেপ দেয়ার দরকার। আর বিদ্বেষ ছড়িয়ে যদি দুর্বৃত্ত সফল হয়ে যায় সেই

প্রলেপযুক্ত মিথ্যাটি বর্তায়, যাদের মধ্যে সেটি ছড়িয়েছে, তাদের ওপর। যেটা ওই মানব গোষ্ঠীর জন্যে বছরের পর বছর কাঁধে বয়ে বেড়ানোর শঙ্কা তৈরি হয়।

কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য হচ্ছে, আমরা চাইলেই এখনই এই বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধ করতে পারবো না। অনলাইনে তো আরও না। জাতিসংঘের বার্তা অনুযায়ী কাজ চলছে প্রতিরোধের। কিন্তু কবে নাগাদ মানুষ এই বিদ্বেষ বার্তা থেকে সুরক্ষা পাবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। তাহলে উপায় কী? এরকম চলতেই থাকবে? ততদিনে যে ক্ষতি হবে এর দায় কে নেবে? সুতরাং আমাদের বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধের তাৎক্ষণিক সমাধান চাই।

আমি প্রচলিত গণমাধ্যমে কাজ করছি ২৫ বছরের বেশি। আমার চিন্তা বলে, এই বিদ্বেষ নিয়ে প্রথম প্রতিরোধটা আসা উচিত প্রচলিত গণমাধ্যমের কাছ থেকে। কোন বার্তা ছড়ালেই সেটা সমাজের জন্যে বিদ্বেষ কী না তাদেরকেই প্রথম চিহ্নিত করতে হবে। কারণ তারা ওই সমাজের মানুষ নিয়েই কাজ করে। সামাজের আদি নাড়ি নক্ষত্র তাদের জানা। আমি যুদ্ধে নামতে বলি না। শুধু বলি বিদ্বেষটা কেন ছড়ানো হলো? কে ছড়ালো? কী ভাবে ছড়ালো? কিসের বিনিময়ে ছড়ালো ? সত্যটা কী? এরকম কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই হবে। মাধ্যমটা যেহেতু “গণ” সেহেতু “গণ” এর প্রতি তাদের একটা দায় আছে বৈকী?

তবে ইচ্ছে থাকলেও গণমাধ্যমের পক্ষে অনেক সময় এই দায় নেয়া অসম্ভব হতে পারে। কারণ একটি গণমাধ্যমে কিছু প্রচার হতে হলে, প্রমাণ অপ্রমাণের বিষয় থাকে। তথ্য সূত্র লাগে। পক্ষ বিপক্ষ লাগে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মত সে চাইলেই কিছু একটা লিখে দিতে পারে না। যে কারণে অনেক বিষয় সত্য বুঝতে পারলেও, সে সত্য প্রকাশ করতে পারে না। এক্ষেত্রে শেষ ভরসা সমাজের মানুষ। আমি মানুষের বোধের ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করি। তাই যেসব মানুষ দাবি করেন, তাদের বোধ শক্তি প্রখর তাদেরই বিদ্বেষ রোধে এগিয়ে আসতে হবে। আমি তাকেও যুদ্ধে নামতে বলি না। শুধু বলি, আগে নিজে বিষয়টি বুঝুন এবং যিনি বোঝেন না তার সঙ্গে আলোচনা করুন। জাতিসংঘও কিন্তু বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধের জন্যে মিডিয়া লিটারেসি বা গণমাধ্যম স্বাক্ষরতার কথা বলছে। এই মিডিয়া লিটারেসি আসলে বোধ সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

বিএনপির জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির অবসান হবে কি?

বিএনপির জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির অবসান হবে কবে? এই প্রশ্নটিই বর্তমান লেখাটির শিরোনাম করা হয়েছে! বিএনপি ইতোমধ্যে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দলীয় সম্পৃক্ততার কারণে অনেকে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করলেও কানাডার আদালতের রায় এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।
এখবর এখন পক্ষে-বিপক্ষের সবারই জানা যে, কানাডার আদালত পঞ্চমবারের মত বিএনপি-কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে আখ্যায়িত করে রায় দিয়েছে। সেই বিএনপি গত ২৮ অক্টোবর (২০২৩) ঢাকায় তাদের মহাসমাবেশ থেকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়। ‘পলিটিক্যাল ইকোনোমি অব এনার্জি ট্রঞ্জিশন’ এর প্রফেসর ফ্রাঁসোয়া ব্যাফোইল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের রাজনীতির সাথে ‘হ্যালুসিনেশনের’ মিল খুঁজে পেয়েছেন।
যদিও ২৮ তারিখে সমাবেশ করার অনুমতি নেয়ার সময় ঢাকা মহানগর পুলিশের কাছে ‘শান্তিপূর্ণ’ সমাবেশ করা হবে বলে অঙ্গীকার করেছিল বিএনপি নেতৃত্ব। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল দায়িত্বপালনরত একজন পুলিশ সদস্যের ওপর লাঠি হাতে বোধশূন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বেধড়ক পেটানো শুরু করে।
বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন। সমগ্র এলাকা এবং তার আশে-পাশে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল। ফলে, যেসব ঘটনা ঘটেছে সেইসব কিছুই সিসিটিভির ভিডিওতে ধারণ করা হয়েছে।
একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক পুলিশ সদস্য মুমূর্ষু অবস্থায় ফুটপাতে পড়ে আছেন। পাশের গলি থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এলো এবং একজন হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা সেই অসহায়, আহত পুলিশ সদস্যকে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পেটাতে থাকল। হতভাগ্য সেই পুলিশ সদস্য দুর্বলভাবে হাত নাড়াচ্ছেন। অর্থাৎ তখনও বেঁচে আছেন। মুহূর্তেই লাঠি হাতে ছুটে এলো আরও অনেকে এবং লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে পেটাতে থাকল। কেউ একজন সেই পুলিশ সদস্যকে কোপাতে থাকে। নিথর পড়ে থাকা একজন মানুষকে অনেকে মিলে উন্মাদের মতো আঘাতের সেই দৃশ্য অসহনীয়! কিন্তু আঘাতকারীদের মধ্যে কোনো দ্বিধা বা দয়ার উদয় হয় নাই। ঢাকা মহানগর পুলিশের কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজকে যে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করল বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা, টেলিভিশনের পর্দায় সে দৃশ্য দেখে চোখের পানি আটকাতে পেরেছে, এমন লোক কমই

আছে। পারভেজের পিতা সেকান্দার আলী মোল্লা ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীন বাংলাদেশের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে দায়িত্বপালন করতে যেয়ে বিএনপির নেতা- কর্মীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়!
আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, মাটিতে পড়ে যাওয়া পুলিশ সদস্যকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে অনেকে। কেউ কেউ মুখে ইটের টুকরো দিয়ে বারবার আঘাত করছে; শরীরের ওপর উঠে লাথি মারছে। পুলিশ সদস্যের ওপর নিষ্ঠুরভাবে লাঠি ও চাপাতি দিয়ে যারা করেছে তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজেরই লোক। সহিংসতার উন্মত্ততায় মেতে ওঠা এইসব লোক আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেই সমাজেরই একটি অংশ। তারা বিএনপি-জামায়াত-এর নেতা- কর্মী। ভাবতে কষ্ট হয়, নির্মম এসব লোক আমাদেরই সমাজের! যে সমাজে এমন মানবিকতাবিহীন লোকেরা ঘুরে বেড়ায়, সেই সমাজ নাগরিকদের জন্য কতটা বিপজ্জনক আর ঝুঁকিপূর্ণ! সেই চিন্তা আমাদের ভীত আর বিপর্যস্ত করে তোলে!
বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ শনিবার রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে দলটির নেতা–কর্মীরা সহিংসতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এসময় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালনরত পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর দলটির নেতাকর্মীরা আক্রমন করে। দায়িত্বপালনরত অবস্থায় এক পুলিশ সদস্যসহ ২ জন নিহত হন। গুরুতর আহত একজন আনসার সদস্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে মৃত্যুবরণ করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাকরাইল, মতিঝিল, মগবাজার, হাইকোর্ট মোড়, বিজয়নগর ও আরামবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াত এর নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে একজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত তিনশ’ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৪১ জন পুলিশ সদস্য এবং ১৮ জন সাংবাদিক রয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে কাকরাইলে পুলিশ বক্স ও বিভিন্ন স্থানে অন্তত দেড় ডজন গাড়িতে আগুন এবং দুই ডজন যানবাহন ভাঙচুর করে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা।
এদিকে মহাসমাবেশের দিন বিকেলে মালিবাগ ফ্লাইওভারের ওপর বলাকা পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। ওই বাসে আগুনের ঘটনাটি ধারণ করা একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়ন একটি বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরা অবস্থায় বাসটির পাশে ঘুরছেন। বুলেট প্রুফ জ্যাকেটে ‘প্রেস’ লেখা রয়েছে। তার হাতে একটি লাঠি। সঙ্গে বেশ কয়েকজন যুবক।
‘পলিটিক্যাল ইকোনোমি অব এনার্জি ট্রাঞ্জিশন’ এর প্রফেসর ফ্রাঁসোয়া ব্যাফোইল তার ‘দ্য পলিটিক্স অব ডেস্ট্রাকশন’ গ্রন্থে ইউএসএসআর, পোল্যান্ডের পিআইএস পার্টি এবং ইসলামিক স্টেট-এর কর্মকান্ড যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সে অনুযায়ী বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ভিত্তিক রাজনীতির ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মনোবিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

সন্ত্রাসী কর্মকান্ডভিত্তিক রাজনীতির হোতারা ‘স্থান এবং সময়ের’ রেফারেন্স ধ্বংস করে(যেমন ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার নমুনা ধ্বংস করেছিল বিএনপি-জামায়াত জোট); এর পরিবর্তে সন্ত্রাসীদের মূল হোতাগণ তাদের পছন্দমত কোনকিছু দিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা দাঁড় করে থাকেন; এবং আশ্রয়ের জন্য ক্ষতাবান ব্যক্তিদের ভালবাসা বা ঘৃণার ভাব বুঝে সামাজিক স্থানগুলিতে তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে থাকে। কানাডার আদালত কর্তৃক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত বিএনপির বেলায়ও তেমনটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাদের কৃত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে অস্বীকার এবং এটিকে অন্য উপায়ে পুনরুৎ্পাদন করে, যা স্বপ্নদ্রষ্টার (যেমন বিএনপির লন্ডনস্থ নেতা) ইচ্ছার সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে। একারণে সন্ত্রাসীদের থেকে উদ্ভূত রাজনীতির সাথে একটি হ্যালুসিনেশনের (যার অর্থ অমূলক বা বিভ্রান্তির)অনেক মিল রয়েছে। এই বিশ্লেষণের পরে আমরা এই উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, অতীতের ন্যায় বিএনপি তাদের বর্তমানের জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতি পরিত্যাগ করবে না। এর জন্য তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং তাদের সেই মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যার সমর্থন তারা দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও পাবে। যেমনটি ইউএনএইচসিআর ২৮ অক্টোবর ২০২৩ বিএনপি-জামায়াত কর্তৃক সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করছে!এই পরিস্থিতিতে সঠিক ঘটনা যথাযথভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরে বিএনপি-জামায়াতের মুখোশ খুলে দিতে হবে। লেখক: সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ। সাবেক ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, সাবেক চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।